বিশ্বমানব হবি যদি শাশ্বত বাঙালী হ!

অভিজিৎ রায়

- ‘লন ভাই, বাংলা পেপার লইয়া যান, আইজক্যার পেপার’।
- আইজক্যার নি?
- হ আইজক্যার, একটু আগে দিয়া গেল।
- কত দাম?
- দেড় টেকা[১] দেন।
- ধুর মিয়া, এক টেকায় কিনি সব সময় ...

লিটল ইন্ডিয়া জায়গাটা সিঙ্গাপুরের ‘বাংলা’[২] দের কাছে অনেকটা যেন সৌদি আরবের মক্কা। যে যেখানেই থাকুক না কেন সারা সপ্তাহের কাজ কর্ম শেষে রোববার দিন সেরাঙ্গুনের রাস্তায় জড় হওয়া তাদের চাই ই চাই। রোববার দিনটা আক্ষরিক অর্থেই হয়ে ওঠে যেন ‘বাঙ্গালীদের মিলন মেলা’। ওই দিন কাউকে যদি বাংলাদেশ থেকে তুলে এনে লিটল ইন্ডিয়ার ওই রাস্তায় ছেড়ে দেওয়া হয়, তিনি হয়ত ভুল করে ধরেই নেবেন যে তিনি ঢাকা শহরের গুলিস্তান এলাকায় ঢুকে পড়েছেন। প্রায় পচিশ থেকে ত্রিশ হাজার বাংলাভাষাভাষী লোক - কেউ হাটছে, কেউ চেঁচিয়ে কথা বলছে, কেউ খিস্তি-খেউর করছে, আর কেউবা আস্তিন গুটিয়ে ডাল দিয়ে ভাত মাখিয়ে খেতে বসেছে - ‘মুহম্মদিয়া রেস্টুরেন্টে’। দোকানের নামগুলিও সব বাংলায়, মানে বাংলা হরফে লেখা - মুহাম্মদিয়া, রাধুনী, তন্ময়, -এ এক অভাবনীয় ব্যাপার; সিঙ্গাপুরের আর কোথাওই বোধ হয় এ ব্যাপারটা দেখা যাবে না। ওই দিন যারা লিটল ইন্ডিয়ায় ভীড় করেন তাদের মধ্যে প্রায় সবাই হচ্ছে যাদের আমরা বলি - ‘ওয়ার্কার’; ‘এলিট’ সমাজের বাঙ্গালীরা অবশ্য পারত পক্ষে ‘গ্যাঞ্জাম’ দেখে রোববারের দিনটিতে সেরাঙ্গুনে পা রাখেন না।

তবে এই এলিটরা সিঙ্গাপুরে সংখ্যায় খুবই অল্প। হাতে গোনা চারশটি পরিবার হবে হয়ত[৩]। এদের কেউবা এন.ইউ.এস বা এন.টি. ইউ এর মত বিশ্ববিদ্যালয় গুলোতে শিক্ষক বা ছাত্র হিসেবে আছেন, কেউ জাহাজের ক্যাপটেন, বা ম্যারিন ইঞ্জিনিয়র, অথবা শুধুই ইঞ্জিনিয়র, অনেকে আবার আর্কিটেকট কিংবা কেউ হয়ত পুরোদস্তুর ব্যবসায়ী। এদের অনেকেই সিঙ্গাপুরের নাগরিক কিংবা এখানে স্থায়ীভাবে বসবাসরত ‘পার্মানেন্ট রেসিডেন্ট’ বা সংক্ষেপে পি.আর। অনেকে আবার সিঙ্গাপুরকে অস্ট্রেলিয়া বা উত্তর আমেরিকায় স্থায়ী নিবাস গড়ার মধ্যবর্তী একটি প্ল্যাটফর্ম হিসেবে ব্যবহার করেন। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে বলতে

---

[১] *এই ‘টেকা’ বাংলাদেশী টাকা নয়, সিঙ্গাপুরী ডলার। সিঙ্গাপুরে বসবাসরত শ্রমিকেরা ডলারকে ‘টেকা’ বা ‘টাকা’ বলে থাকে।*

[২] *সিঙ্গাপুরে বসবাসরত বাঙালী শ্রমিকেরা একে অপরকে ‘বাংলা’ নামে অভিহিত করে থাকেন।*

[৩] *New Trends and Changing Landscape of Bangladeshi Migration, Habibul Haque Khondker, Report on International Labour Migration from South Asia, pp 57-88*

পারি আমার অনেক বন্ধুবান্ধবেরাই যারা আজ ক্যানাডা বা আমেরিকায় বসবাস করছেন সিঙ্গাপুরকে এধরনের প্ল্যাটফর্ম হিসেবে ব্যবহার করেছিলেন একটা সময়।

এই স্বল্প সংখ্যক 'এলিট'দের কথা বাদ দিলে সিঙ্গাপুরের বাংলা ভাষাভাষীদের পুরো অংশটিই কিন্তু সেই খেটে খাওয়া মানুষ, যাদেরকে আমি উপরে 'ওয়ার্কার' হিসেবে চিহ্নিত করেছি। সিংঙ্গাপুরে এই ওয়ার্কারদের সংখ্যা প্রায় ষাট হাজারের মত[৪]। এদের দেশান্তরী হবার পেছনে একটা ইতিহাস আছে। সে ইতিহাসটি বলবার আগে সিঙ্গাপুর দেশটি সম্বন্ধে একটুখানি জেনে নেওয়া দরকার। সিঙ্গাপুর শুধু এশিয়াতেই নয়, এ পৃথিবীতেই অত্যন্ত দ্রুতগামী অর্থনৈতিকভাবে ক্রমবর্ধিষ্ণু একটি দেশ হিসেবে পরিচিত। সিঙ্গাপুর মালয়শিয়া থেকে 'বিচ্ছিন্ন' হয়ে স্বাধীন হয় ১৯৬৫ সালে, তুলনামূলক বিচারে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার বছর পাঁচেক আগে। স্বাধীন হবার পর থেকেই সরকার ও জনগণের নিরন্তর প্রচেষ্টায় এটি অত্যন্ত শিল্পসমৃদ্ধ, অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী একটি দেশে পরিনত হয়েছে। যেখানে বাংলাদেশের অর্থনীতি পেছাতে পেছাতে আজ তলানীতে এসে ঠেকেছে সেখানে প্রায় একই রকম অবস্থা থেকে যাত্রা শুরু করে ১৯৯৫ সালের মধ্যে সিঙ্গাপুরের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পেয়েছে শতকরা ৮.৫ ভাগ হারে, যা খোদ আমেরিকার বার্ষিক সমৃদ্ধির তুলনায় তিনগুন বেশী[৫]। কিন্তু এই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সাথে তাল মিলিয়ে জনবল তো আর বাড়েনি, ফলে একটা সময় দেখা দিয়েছে শ্রমিক স্বল্পতা। শ্রমিক স্বল্পতা সমাধানের একটা সহজ উপায় হচ্ছে হত-দরিদ্র তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলো থেকে সুলভ-মূল্যে শ্রমিক আমদানী। সিঙ্গাপুরও তাই করল; সমস্যা সমাধানের তড়িৎ ব্যবস্থা হিসেবে জলের দামে কিনে আনলো কায়িক শ্রম - 'অন্ধের যষ্ঠি' ওই তৃতীয় বিশ্ব থেকেই। এরই ফলশ্রুতিতে ধীরে ধীরে এ দেশে তৈরী হল বিশাল এক বৈদেশিক জনশক্তি। বর্তমানে সিঙ্গাপুরে এই বিদেশী শ্রমিকের সংখ্যা পাঁচ লক্ষাধিক, যা মোট জনশক্তির ৩০ ভাগ; যে কোন বিচারে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে কিন্তু সর্বোচ্চ।

যদিও বিদেশী শ্রমিকদের জন্য সিঙ্গাপুরের দরজা খুলে গিয়েছিল ষাটের দশকের গোড়াতেই, বাংলাদেশ থেকে গণহারে এখানে শ্রমিক আসা শুরু হয় মূলতঃ নব্বই এর দশকে - সেই উপসাগরীয় যুদ্ধ বা 'গালফ ওয়ারের' পর থেকে। যে কোন দেশের প্রেক্ষাপটেই শ্রমিকদের দেশান্তরী হবার পেছনে কিছু কারণ থাকে। সমাজবিজ্ঞানীরা অনেক আগে থেকেই সারা বিশ্বের শ্রমিকদের মাইগ্রেশন বা দেশান্তরী হওয়া নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেছেন এবং এখনো করছেন। যেমন, সাসেক্স বিশ্ববিদ্যালয়ের জিওগ্রাফি বিভাগের অধ্যাপক রোনাল্ড স্কেলডনের কথা বলা যায়। দারিদ্রতা আর শ্রমিকদের দেশান্তরের বিষয়ে তিনি একজন বিশেষজ্ঞ।

---

[৪] *সংখ্যাটি নিয়ে মতভেদ আছে। Bangladeshi Workers in Singapore: A sociological Study of Temporary Labour Migration, PhD Thesis, Md. Mizanur Rahman দ্রষ্টব্য*

[৫] *Migration as Status-Enhancement: A Study of Bangladeshi Workers in Singapore, Md. Mizanur Rahman, National University of Singapore*

স্কেলডন মনে করেন শ্রমিকদের 'নিজভূম ছেড়ে পরবাসী' হওয়ার পেছনে অন্যতম যে কারণটি কাজ করছে তা হল হল দারিদ্র্য[৬]। এটা তো স্বাভাবিকই। তবে এই 'দারিদ্র্যের কারণে দেশত্যাগের' বাইরেও আরেকটি বিষয় আছে, যা অনেক সময়ই বিশেষজ্ঞেরই দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে; আর তা হল - দেশান্তরী হবার কারণে বা ফলশ্রুতিতে দারিদ্র্য। হ্যা, দারিদ্র্যের কারণেই মানুষ শুধু দেশান্তরী হয় নি, বরং দেশান্তরী হয়েও আবার অনেকে দরিদ্র হয়েছে। Straits Times এ ১৯৯৯ সালের ১৮ ই ডিসেম্বর তারিখে 'Journey of Hope' নামে একটি মর্মস্পর্শী প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। লেখক শারন ভাসুর মতে, প্রতি বছর প্রায় ৩০,০০০ বাংলাদেশী জমি-জমা, গরু-বাছুর বিক্রি করে হাজার হাজার টাকা ধার-কর্জ করে সিঙ্গাপুর পাড়ি জমানোর চেষ্টা করে সোনার হরিণের খোঁজে। যেমন দাউল মিয়ার কথাই ধরা যাক। প্রায় দেড় লক্ষটাকা ঋণ (দেশীয় ভাষায় ওরা বলে 'চালান') করে বেচারা সিঙ্গাপুর এসেছিল 'কনস্ট্রাকশন ওয়ার্কার' হিসেবে। কিন্তু ছ'মাসের মধ্যে দাউল মিয়া চাকরি হারায়। ভেবেছিল চাকরি করতে করতে দেশে প্রতিমাসে দেশে টাকা পাঠিয়ে চালানের টাকা শোধ করবে। তা তো হলই না, বরং জমি-জমা সব হারিয়ে, একরকম নিঃস্ব হয়েই আজ তাকে দেশে ফিরতে হচ্ছে। আর মড়ার উপর খারার ঘা হিসেবে মাথার উপর তো বিশাল ঋণের বোঝা আছেই। দাউল মিয়ার দু চোখ অন্ধকার। আপনি যদি লিটল ইন্ডিয়ায় রোববার সন্ধ্যায় 'মধ্যবিত্ত সুলভ' উন্নাসিকতা বাদ দিয়ে সাধারণদের ভীড়ে মিশে যেতে পারেন আর দু-দন্ড বসে সুখ-দুঃখের আলাপ করতে পারেন, দেখবেন, আপনার চারপাশে এমন অনেক দাউল মিয়া। কারও চাকরী গেছে, কারো বা চুক্তি নতুন করে নবায়ন হয়নি, কাউকে আবার বাধ্যতামূলক ছুটি দেওয়া হয়েছে। পরিসংখ্যানে দেখা গেছে যে, চাকরী করতে এসে একবছরের মধ্যে যাদের চাকরী যায় কিংবা চুক্তি বাতিল হয়ে যায়, তাদের পক্ষে আসলে চালানের পুরো টাকা কখনই শোধ করা সম্ভব হয় না। আমি যখন ১৯৯৮ সালের শেষভাগে সিঙ্গাপুর এসেছিলাম তখন দক্ষিণ পুর্ব এশিয়ার দেশ গুলোতে চলছিল ভয়াবহ অর্থনৈতিক মন্দা। ওই অঞ্চলে মন্দার প্রথম সূত্রপাত কিন্তু ঘটেছিল ১৯৯৭ এর মাঝামাঝি সময়ে- থাইল্যান্ডে। তারপর অল্প সময়ের মধ্যেই থাইল্যান্ডের সীমানা পার হয়ে অতি দ্রুত আন্যান্য আসিয়ান দেশগুলোর মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। আমি নিজ চোখে দেখেছি কিভাবে বাংলাদেশ থেকে দেশান্তরী শ্রমিকরা মন্দার শিকার হয়েছিল - অনেকেরই ওয়ার্ক পার্মিট বাতিল হয়েছিল, আর তারপর দেশত্যাগে বাধ্য করা হয়েছিল।

তবে সে হিসেবে কিন্তু 'বাঙ্গালী এলিট'রা তুলনামূলকভাবে অনেক ভাল আছে। ভাল থাকারই কথা। কারণ আগেই বলেছি এই এলিটদের প্রায় প্রত্যেকেই সিঙ্গাপুরের নাগরিক কিংবা এখানে স্থায়ীভাবে বসবাসরত পি.আর। ফলে চাকরী চলে গেলেও সিঙ্গাপুর থেকে তাড়া খেয়ে বাড়ী ফিরে যাওয়ার ভয় নেই। এটা একটা বড় নিশ্চয়তা। ভাত-কাপড়ের নিশ্চয়তা থাকলে যা হয়, বাড়তি কিছু করার ইচ্ছা জাগে মনে। আর সে জন্য এরাই কিন্তু

---

[৬] *Migration and poverty, Ronald Skeldon, Asia-Pacific Population Journal, vol. 17(4): 67-82, 2002.*

উদ্যোগ নিয়ে দেশের বাইরে গিয়েও 'বাঙ্গালীত্বের চর্চা' করে চলেছে। আবার অনেকে বলেন, দেশের বাইরে গেলেই নাকি দেশের প্রতি 'টান'টা বৃদ্ধি পায়। কারণ যাই হোক না কেন, ব্যাপারটা মন্দ নয় অবশ্য। বরং উদ্দেশ্য এবং সাফল্যের নিরিখে বিচার করলে তাঁদের অবদানকে অতিরিক্ত গুরুত্ব দিতেই হবে। সিঙ্গাপুরের বহুল আলোচিত 'বাংলা স্কুল'টির কথাই ধরা যাক। ১৯৮০ সালের দিকে 'বাংলা ল্যাংগুয়েজ এন্ড লিটারারি সোসাইটি'র উৎসাহী সদস্যরা সিঙ্গাপুরে বসবাসরত প্রবাসী বাঙ্গালীদের সন্তানদের বাংলাভাষা, সর্বোপরি দেশজ কৃষ্টি আর সংস্কৃতির সাথে পরিচয় করিয়ে দেবার উদ্দেশ্যেই গড়ে তুলেছিল স্কুলটি। প্রথম দিকে স্বল্প সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী (৫৬ জন) নিয়ে শুরু হলেও এর ব্যাপকতা বৃদ্ধি পায় মুলতঃ ১৯৯৪ সালে যখন সিঙ্গাপুর সরকার বাংলাভাষাকে অন্যতম দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে স্থানীয় শিক্ষা ব্যবস্থায় স্থান দেয়। ছাত্র ছাত্রীদের বাংলা শেখার উদ্যোগ তো আছেই, সেই সাথে প্রতিবছর থাকে 'বাংলা ল্যাংগুয়েজ এন্ড লিটারারি সোসাইটি'র উদ্যোগে নানা ধরনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন; কখনও একুশে ফেব্রুয়ারী উপলক্ষে, কখনও বা ২৬ এ মার্চ উপলক্ষে আবার কখনও বা পয়লা বৈশাখে। এই ব্যাপারটা আমার কাছে খুব লোভনীয়। বাংলাস্কুলের ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা যখন এ ধরনের কোন অনুষ্ঠানে সমবেতভাবে দেশাত্মবোধক গান পরিবেশন করে - 'জন্ম আমার ধন্য হলো মাগো...' তখন মনেই হয় না আমি বাংলাদেশের বাইরে কোথাও আছি। অনেক সময়ই আবার বাইরে থেকে বিখ্যাত শিল্পীদের নিয়ে আসা হয় - এপার বাংলা ওপার বাংলা মিলিয়ে। সিঙ্গাপুরে বসে থেকেই আমি শুনেছি হৈমন্তী শুক্লা, সুবীর নন্দী, মমতাজ প্রমুখ শিল্পীর গান, দেখেছি শীবলি-শামীম আরা নিপার নাচ, অথবা কোন বিখ্যাত শিল্পীর জাদু। এ তো কম পাওয়া নয়! আবার প্রায়শঃই এ ধরণের অনুষ্ঠাণ যখন করা হয়, উপরি হিসেবে থাকে বাংলাদেশী খাবার দাবারের ঢালাও ব্যবস্থা। পিঠা-পুলি, পাটিশাপটা থেকে শুরু করে হালিম, চটপটি, সিঙ্গারা-সমোচা এমনকি চিকেন বিরিয়ানী -কি নেই সেখানে! বিদেশ বিভুইয়ের যান্ত্রিক জীবনে অভ্যস্ত স্বপ্ন বিলাসীরা বছরে অন্তত একটি দিনের জন্য হলেও 'স্বদেশী আমেজ' উপভোগ করেন।

তবে এই 'এলিট সোসাইটি'কে বাংলা সংস্কৃতির 'ধারক ও বাহক' হওয়ার সকল কৃতিত্ব দিয়ে দিলে ব্যাপারটা একপেশেই হয়ে যাবে বৈকি। আসলে 'সংস্কৃতি' বলতে কিছু মধ্যবিত্ত আর উচ্চমধ্যবিত্ত মানুষের গায়ে পাঞ্জাবী লাগিয়ে একুশের অনুষ্ঠান করা কিংবা পয়লা বৈশাখে শখ করে 'পান্তা খাওয়া' আর ঢুলু ঢুলু চোখে রবীন্দ্রসঙ্গীত শোনাইই তো কেবল নয়, যদিও দীর্ঘদিনের লালিত ঔপনিবেশিক মন-মানসিকতায় আমরা অনেক সময়ই অমনটিই ভেবে নেই। সাধারণ খেটে-খাওয়া মানুষদের বাদ দিয়ে আসলে কোন সংস্কৃতি হয় না, কখনই হয়নি- লেখা-পড়া জানা মধ্যবিত্তদের কাছে এ যতই বেমানান শোনাক না কেন। জারি-সারি-ভাটিয়ালী থেকে শুরু করে বাউল-সহজিয়া, পুথি-পাঠ, যাত্রা, কবি-গান, সব কিছুই তো গড়ে উঠেছে স্বতস্ফুর্ত ভাবে সাধারণ জনগণের অংশগ্রহণে - এ প্রমাণ তো আমাদের

সংস্কৃতিতে ভুরি ভুরি। সেরাঙ্গুনের রাস্তায় গেলেই বোঝা যায়, ওই হত-দরিদ্র মানুষ গুলো কিভাবে তাদের সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রেখেছে, তাদের নিজেদের মত করে। এখানে মমতাজ, কাঙ্গালিনী সুফিয়া, ইন্দ্রমোহন রাজবংশীদের গান কি ভীষণ জনপ্রিয়! দেলওয়ার হোসেন সাইদীর ওয়াজ-মাহফিলের ক্যাসেট কিংবা হিন্দী ছবির আগ্রাসন বহমান ধারাকে কিছুটা দিকভ্রষ্ট করলেও বাঙালী আবহমান ঐতিহ্যের মূল সুরটিকে ম্লান করতে পারেনি এতটুকুও।

আমি মাঝে মধ্যে কিন্তু ভাবি এই যে দেশ কালের সীমানা পেরিয়ে পৃথিবীবাসীর কাছে বাংলাভাষার এত্ত প্রচার আর প্রসারের আয়োজন এর পেছনে উদ্দেশ্যটা কি? এটাও কি প্রচ্ছন্ন অর্থে এক ধরণের সাম্প্রদায়িকতা নয়? নাকি 'বিদেশী'দের কাছে নতুন করে আত্মপরিচয়ের সন্ধান লাভের মেকি চেষ্টা? নাকি স্রেফ এক ধরনের 'জাতিগত অহংবোধ'? হয়ত কোন কোন ক্ষেত্রে ব্যাপারগুলো সত্যি। তবে এই গন্ডিবদ্ধ ধারণার বাইরেও একটা বাস্তব সত্য আছে, যে সত্যটা আমরা প্রায়ই ভুলে যাই। পৃথিবীর সব ভাষাগুলোর মধ্যে *বাংলা ভাষার একটা আলাদা মর্যাদা*[৭] তো আছেই, তার মধ্যে বাঙ্গালী জাতিই পৃথিবীর বুকে একমাত্র জাতি যারা মাতৃভাষার দাবী প্রতিষ্ঠা করতে রক্ত দিয়েছে, যার কারণে আজ একুশে ফেব্রুয়ারী পেয়েছে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস'-এর মর্যাদা । তবে সেটাই শেষ কথা নয়, বাংলার আবহমান কৃষ্টি, সংস্কৃতি আর লৌকিক ঐতিহ্য বিশ্লেষণ করলেই বেরিয়ে আসে বাঙালীর হাজার বছরের ঐতিহ্য কুপমুন্ডুকতার নয়, বরং ঔদার্যের, নির্মলতার আর মুক্ত-বুদ্ধির। সে জন্যই বাঙালীত্বের চর্চাকে 'বিশ্বমানব' হবার সোপান হিসেবে ধরে নেওয়া যায়- 'বিশ্বমানব হবি যদি শাশ্বত বাঙালী হ!' ; আর সেজন্যই নতুন করে আমাদের বাঙালী হওয়ার প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। এ কোন আত্মপরিচয়হীন হিনমন্যের ঠিকানা খোঁজার অপচেষ্টা নয়, বরং ঋজু ভঙ্গীতে উঠে দাঁড়ানো স্পর্ধিত জাতির এক গর্বিত আত্মোপলব্ধি ।

এপ্রিল ১৬, ২০০৫

অভিজিৎ রায় পেশায় প্রকৌশলবিদ, ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অব সিঙ্গাপুরের গবেষক, মুক্ত-মনা (*www.mukto-mona.com*)র ফাউনডিং মডারেটর। ইমেইল : charbak_bd@yahoo.com

প্রবন্ধটি দৈনিক ভোরের কাগজে (১৮ই এপ্রিল, ২০০৫) এবং দৈনিক জনকণ্ঠে (১৯ এ এপ্রিল, ২০০৫) প্রকাশিত হয়।

---

[৭] *সাম্প্রতিক জরিপ অনুযায়ী, বাংলাভাষা ম্যান্ডারিন, স্প্যানিশ আর ইংরেজীর পর ৪র্থ স্থান করে নিয়েছে। আগের হিসেবে বাংলাভাষার অবস্থান ছিল হিন্দী এবং আরবী ভাষার পর। কেবলমাত্র 'মাতৃভাষা হিসেবে ব্যবহারকারী'দের সংখ্যার ভিত্তিতে The Summer Institute for Linguistics (SIL) এর জরিপে এই তথ্য তুলে ধরা হয়। বিস্তারিত : http://www2.ignatius.edu/faculty/turner/languages.htm*